

আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ গায়ওয়ায়ে আহযাব (খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ) (غَزْوَةُ الْأَحْزَابِ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

গায়ওয়ায়ে আহযাব (খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ)

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সাহাবাগণের গোপনীয়তা রক্ষা করা সত্ত্বেও প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলেই ওয়াকিবহাল হয়ে গেলেন এবং এর ফলে আসন্ন এক বিপদের আভাষ ক্রমেই তাদের সামনে প্রকাশ পেতে থাকল। প্রকৃতই মুসলিমগণ সে সময় এক অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। পিছনে ছিল বনু কুরাইযাহ যাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতো উপযুক্ত কোন ব্যবস্থাই মুসলিমগণের ছিল না। সম্মুখভাগে ছিল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত মুশরিক বাহিনী যাদের সম্মুখ থেকে সরে আসা কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। অধিকন্তু, মুসলিম শিশু ও মহিলাগণ বিশেষ কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই বিশ্বাসঘাতক ইহুদীগণের সন্নিহিতে অবস্থান করছিলেন। বিভিন্ন কারণে মুসলিমগণ দারুণ দুর্ভাবনার মধ্যে নিপতিত হন যার সম্পর্কে এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে,

(وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا) [الأحزاب: 10]

‘তখন তোমাদের চক্ষু হয়েছিল বিস্ফারিত আর প্রাণ হয়েছিল কণ্ঠাগত; আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকম (খারাপ) ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে, এখানে মু’মিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তাদেরকে প্রচণ্ড কম্পনে প্রকম্পিত করা হয়েছিল।’ [আল-আহযাব (৩৩) : ১০]

এমনি জটিল এক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কতগুলো মুনাফিকও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তারা বলতে লাগল, ‘মুহাম্মাদ (ﷺ) আমাদের সঙ্গে ওয়াদা করতেন যে, আমরা কায়সার ও কিসরার ধন ভান্ডার ভোগ করব, অথচ এখন অবস্থা হচ্ছে, প্রস্রাব এবং পায়খানার জন্য বের হলেও জীবনের ভয় রয়েছে। কোন কোন মুনাফিক তাদের সম্প্রদয়ের নিকট এমন কথাও বলল যে, ‘আমাদের ঘরবাড়িগুলো শত্রুদের সামনে খোলা পড়ে রয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে আমাদের ঘরবাড়িতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক।’ সেই সময় পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াল যে, বনু সালামাহ গোত্রের লোকজনদের মন ভেঙ্গে গেল এবং তাঁরা ফিরে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করতে থাকল। এ সব লোকের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করলেন,

(وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا) [الأحزاب: 12, 13]

‘আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলেছিল- আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলেছিল- হে ইয়াসরিববাসী! তোমরা (শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে) দাঁড়াতে পারবে না, কাজেই তোমরা ফিরে যাও। আর তাদের একদল এই বলে নাবীর কাছে অব্যাহতি চাচ্ছিল যে, আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত অথচ ওগুলো অরক্ষিত ছিল না,

আসলে পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।’ [আল-আহযাব (৩৩) : ১২-১৩]

এদিকে সৈন্যদের অবস্থা যখন ছিল এরূপ, অন্যদিকে তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বনু কুরাইযাহর অঙ্গীকার ভঙ্গের সংবাদ অবগত হওয়ার পর বস্ত্র দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত অবস্থায় দীর্ঘ সময় চিৎ হয়ে শুয়ে রইলেন। নাবী কারীম (ﷺ) –এর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে লোকজনদের দুর্ভাবনা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল। কিন্তু কিছু সময় পরই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর মুখমণ্ডল আশার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ‘আল্লাহর আকবার বলে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

(أَبَشِّرُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ بِفَتْحِ اللَّهِ وَنَصْرِهِ)

‘ওহে মুসলিমগণ সাহায্য এবং তোমাদের বিজয়ের শুভ সংবাদ শুনে নাও।’

অতঃপর উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে নাবী কারীম (ﷺ) এক কর্মসূচি প্রণয়ন করেন এবং তার ব্যবস্থা হিসেবে মদীনার নিরাপত্তা বিধানের জন্য সেনা বাহিনীর একটি অংশকে সেখানে প্রেরণ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল শিশু ও মহিলাদের অরক্ষিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে কুচক্রী ইহুদীগণ যাতে তাদের আক্রমণ করতে না পারে তা সুনিশ্চিত করা।

কিন্তু সে সময় এমন এক কূটনৈতিক পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল যার মাধ্যমে শত্রুদের বিভিন্ন দলের ঐক্যের মধ্যে ফাটল সৃষ্টির মাধ্যমে এক এক দলকে অন্যান্য দল থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সম্ভব হয়। এ প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (ﷺ) বনু গাত্তাফান গোত্রের দু’ নেতা উয়াইনাহ বিন হিসন এবং হারিস বিন আওফের সঙ্গে মদীনার উৎপাদনের ১/৩ অংশ দেয়ার শর্তে এমন একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের মনস্থ করলেন যার ফলে এ দুই নেতা নিজ নিজ গোত্রের লোকজনদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে এবং এ অবস্থায় মুসলিমগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া কুরাইশ বাহিনীর উপর প্রবল পরাক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন।

এ কূটনৈতিক কৌশল সম্পর্কে সলা-পরামর্শের এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সা‘দ বিন মু‘আয এবং সা‘দ বিন উবাদাহর সঙ্গে আলোচনা করেন তখন তারা উভয়ে এক বাক্যে আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি আল্লাহর তরফ থেকে এ নির্দেশ লাভ করেন তাহলে কোন প্রশ্ন ছাড়াই তা স্বীকৃত হবে, আর যদি আপনি আমাদের জন্যই তা করতে চান তাহলে আমাদের এর কোন প্রয়োজন নেই। যখন এ সকল লোকজন এবং আমরা সকলেই মূর্তিপূজক ছিলাম তখন এরা অতিথি সেবা এবং ক্রয় বিক্রয় ছাড়া অন্য কোন উপায়ে একটি শয্য কণারও লোভ করতে পারে নি। আর এখন আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের নূর দ্বারা ধন্য করেছেন এবং আপনার মাধ্যমে ইজ্জত দান করেছেন। আমরা তাদেরকে নিজ সম্পদ দান করব? আল্লাহর শপথ! আমরা তো তাদেরকে শুধু তলোয়ারের আঘাত করব। তাদেরকে অন্য কিছু প্রদান করার জন্য আমরা প্রস্তুত নই। নাবী কারীম (ﷺ) তাদেরকে মতামতকে সঠিক সাব্যস্ত করলেন এবং বললেন قَدْ رَأَيْتُ الْعَرَبَ لَمَّا رَأَيْتُ الْكُفْرَ لَمَّا رَأَيْتُ الْعَرَبَ قَدْ رَأَيْتُ الْكُفْرَ (رَمْتَكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ) ‘সমগ্র আরব তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে বলে শুধু তোমাদের খাতিরেই আমি এরূপ করতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা দয়াপরবশ হয়ে এমন এক ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন যে, শত্রুদের নিজেদের মধ্যেই বিভেদ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়ে গেল এবং এর ফলে তাদের সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ল এবং প্রখরতা স্তিমিত হয়ে পড়ল। ঘটনাটি হল, বনু গাত্তাফান গোত্রের নুয়াইম ইবনু মাসউদ ইবনু ‘আমির আশজাঈ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি মুসলিম হয়ে গেছি। কিন্তু আমাদের

সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানতে পারেনি। সুতরাং আপনি আমাকে কোন আদেশ করুন।’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, (فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ) ‘ব্যক্তি হিসেবে যেহেতু তুমি নিতান্তই একক, সেহেতু কোন সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাঁদের ঐক্যে ফাটল ধারানো এবং তাদের মনোবল নষ্ট করার মতো কোন কৌশল তুমি অবলম্বন করতে পার। কারণ, শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার ব্যাপারে এ সব কূটকৌশল অত্যন্ত মূল্যবান। যুদ্ধ অর্থ হচ্ছে কূটকৌশলের খেলা। এ প্রেক্ষিতে নুয়াইম তৎক্ষণাৎ বুন কুরাইযাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

জাহেলিয়াত যুগে বুন কুরাইযার সঙ্গে নুয়াইমের সুসম্পর্ক ছিল। তিনি সেখানে গিয়ে বললেন, আপনাদের এবং আমার মধ্যে যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, আপনারা অবশ্যই তার স্বীকৃতি প্রদান করবেন। তারা বলল, ‘জী হ্যাঁ।’

নুয়াইম বললেন, ‘তাহলে আপনারা এ কথাটাও অবশ্যই স্বীকার করবেন যে কুরাইশদের ব্যাপারটা আপনাদের ব্যাপার হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এ অঞ্চল আপনাদের নিজেদের। এখানে আপনাদের ঘরবাড়ি সহায় সম্পদ সব কিছুই রয়েছে। আরও রয়েছে পরিবার পরিজন। এ সব কিছু পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও যাওয়া আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কুরাইশ ও গাভাফান এ দুই গোত্র এসেছে মুহাম্মাদ (ﷺ)–এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে। আর আপনারা হাত মিলিয়েছেন যুদ্ধ পিপাসু এমন দুই গোত্রের সঙ্গে এখানে যাদের ঘরবাড়ি সহায় সম্পদ কিংবা পরিবার পরিজন বলতে কিছুই নেই। এ কারণে, এখানে কোন সুযোগ সুবিধা লাভের সম্ভাবনা থাকলে তারা পদক্ষেপ নেবে, নচেৎ গোলমাল সৃষ্টি করে বিদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, এখানেই আপনাদের থাকতে হবে এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) থাকবে। আপনারা যদি তাঁর শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের সাহায্য করেন তাহলে যে ভাবেই হোক তিনি অবশ্যই এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।’ নুয়াইমের মুখে এ কথা শোনা মাত্রই বুন কুরাইযা সতর্ক হয়ে বলল, ‘নুয়াইম! বলুন এখন কী করা যায়?’ তিনি বললেন, ‘যে পর্যন্ত কুরাইশ তাদের কিছু সংখ্যক লোক বন্ধক হিসেবে আপনাদের জিম্মায় না রাখবে আপনারা তাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবেন না।’ বুন কুরাইযাহ বলল, ‘আপনি অত্যন্ত সঙ্গত কথাই বলেছেন।’

এরপর নুয়াইম সোজা কুরাইশদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। অতঃপর বললেন, ‘আপনাদের প্রতি আমার যে ভালবাসা এবং সদিচ্ছা রয়েছে তা অবশ্যই আপনাদের বোধগম্য রয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি।’

তারা বলল, ‘জী হ্যাঁ।’

নুয়াইম বললেন, ‘বেশ তাহলে শুনুন, ইহুদীগণ মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে তাদের স্বীকৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং এ কারণে তারা লজ্জিতও হয়েছে। বর্তমানে তারা এ শর্তে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে যে, বন্ধক হিসেবে তারা আপনাদের নিকট থেকে কিছু সংখ্যক লোক গ্রহণ করার পর মুহাম্মাদ (ﷺ)–এর নিকট সমর্পণ করবে এবং এর মাধ্যমে অঙ্গীকার ভঙ্গের ঘাটতি পূরণ করে নেবে। কাজেই ইহুদীগণ বন্ধক হিসেবে কুরাইশদের নিকট থেকে কিছু সংখ্যক লোক চাইলেও কিছুতেই তা দেয়া যাবে না। এরপর নুয়াইম গাভাফান গোত্রে গিয়ে কুরাইশদের নিকট যা বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করলেন। এতে তারাও সজাগ হয়ে উঠল।

এরপর শুক্রবার ও শনিবারের মধ্যবর্তী রাত্রিতে কুরাইশগণ ইহুদীগণের নিকট এ পয়গাম প্রেরণ করে যে, তাদের

অবস্থা কোন সুবিধাজনক স্থানে নেই। ঘোড়া এবং উটগুলো মারা যাচ্ছে। অতএব, ওদিক থেকে আপনারা এবং এদিক থেকে আমরা উভয় দল এক সঙ্গে মুহাম্মাদ (ﷺ)–এর উপর আক্রমণ পরিচালনা করি। এর উত্তরে ইহুদীগণ বলল, ‘আজ শনিবার এবং আপনারা অবগত আছেন যে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে যারা এ দিবসে শরীয়তের আদেশ অমান্য করেছিল কিভাবে তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল। অধিকন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আপনাদের কিছু সংখ্যক লোককে বন্ধক হিসেবে আমাদের নিকট না রাখবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করব না।’

সংবাদ বাহক যখন ইহুদীদের নিকট থেকে এ উত্তর নিয়ে ফেরৎ এল তখন কুরাইশ এবং গাত্তাফানগণ বলল, ‘আল্লাহর কসম! নুয়াইমতো সত্যই বলেছিল।’ কাজেই, তারা ইহুদীগণকে এ কথা বলে পাঠাল, ‘আল্লাহর কসম! আপনাদের হাতে কোন লোককে বন্ধক রাখব না। আসুন আপনারা আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ুন এবং আমরা উভয় পক্ষ এক যোগে দুই দিক থেকে মুহাম্মাদ (ﷺ)–এর বাহিনীকে আক্রমণ করি। এ কথা শুনে বনু কুরাইযাহর লোকেরা পরস্পর পরস্পরকে বলল, ‘আল্লাহর কসম! নুয়াইম তোমাদেরকে সত্যই বলেছিলেন।’ এভাবে উভয় পক্ষের পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা এবং নির্ভরশীলতার পথ বন্ধ হয়ে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়ে গেল। যার ফলশ্রুতিতে তাদের সাহস এবং মনোবল ভেঙ্গে পড়ল।

এ সময় মুসলিমগণ আল্লাহ তা‘আলার সমীপে নিম্নলিখিত দু‘আ করছিলেন :

(اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتَنَا وَآمِنْ رَوْعَاتَنَا)

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দোষত্রুটি ঢেকে রাখুন এবং আমাদেরকে ভয়ভীতি এবং বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখুন।’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিম্নরূপ দু‘আ করেছিলেন :

(اللَّهُمَّ مُنْزِلُ الْكِتَابِ، سَرِيعُ الْحِسَابِ، أَهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ أَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ)

অর্থ : হে আল্লাহ! হে কিতাব অবতীর্ণকারী! দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! এ সেনাবাহিনীকে পরাভূত করুন। হে আল্লাহ! তাদেরকে পরাভূত করুন এবং প্রকম্পিত করুন।[18]

অবশেষে আল্লাহ আপন রাসূল (ﷺ) এবং মুসলিমদের দু‘আ কবুল করে মুশরিকদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করেন এবং মনোবল ভেঙ্গে দেন। অতঃপর তাদের উপর উত্তপ্ত বায়ুর তুফান প্রেরণ করেন। যা তাদের তাঁবু উপড়িয়ে দেয়, মৃত পাত্রসমূহ উলটিয়ে দেয়, তাঁবুর খুঁটিসমূহ উৎপাটন করে ফেলে এবং সব কিছুকে তছনছ করে ফেলে। এর সঙ্গে প্রেরণ করেন ফিরিশতা বাহিনী যাঁরা তাদের অবস্থানকে নড়চড় করে দেন এবং অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করেন।

সেই তীব্র শীতের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাঃ)–কে প্রেরণ করেন মুশরিকদের সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তিনি যখন তাদের সমাবেশ স্থলের নিকট পৌঁছেন তখন প্রত্যক্ষ করেন যে, প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁদের প্রস্তুতিপর্ব প্রায় সম্পন্ন। হুযায়ফা নাবী কারীম (ﷺ)–এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাদের ফেরৎ যাত্রা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। প্রভাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যক্ষ করেন যে, তাদের প্রত্যাবর্তনের ফলে ময়দান একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। কোন প্রকার সাফল্য লাভ ছাড়াই গভীর অসন্তোষ এবং ক্রোধসহ মুসলিমগণের শত্রুদের আল্লাহ তা‘আলা ফেরৎ পাঠিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য একাকী যথেষ্ট হয়েছেন। মোট কথা এভাবে

আল্লাহ আপন ওয়াদা পূরণ করেছেন এবং নিজ সৈন্যদের ইজ্জত প্রদান করেছেন। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।

বিশুদ্ধ মতে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে এবং মুশগিরকগণ আনুমানিক এক মাস যাবৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং মুসলিমগণকে অবরোধ করে রেখেছিল। প্রাপ্ত উৎসগুলোর উপর দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, অবরোধ সূচিত হয়েছিল শাওয়াল মাসে এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটেছিল জুল কা'দা মাসে। ইতিহাসবিদ ইবনু সায়াদের বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে দিন খন্দক থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন সে দিনটি ছিল বুধবার এবং জুলকা'দা মাস শেষ হতে অবশিষ্ট ছিল সাত দিন।

আহযাব যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়ক্ষতির যুদ্ধ ছিল না, বরং সেটা প্রকৃত পক্ষে স্নায়ুযুদ্ধ ছিল। এতে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতির সংঘর্ষ সংঘটিত হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামের ইতিহাসে এ যুদ্ধ ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে মুশরিকদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে এবং সর্ব সমক্ষে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আরবের কোন শক্তির পক্ষেই মদীনার মুসলিমগণের ক্রমবিকাশমান এ শক্তিকে নিঃশেষ করা সম্ভব নয়। কারণ, আহযাব যুদ্ধের জন্য বিশাল বাহিনী সংগৃহীত হয়েছিল, এর চাইতে অধিক শক্তিশালী বাহিনী সংগ্রহ করা তাদের জন্য সম্ভবপর ছিল না। এ জন্য আহযাব থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

(الآن نَغْزُوهُمْ، وَلَا يَغْزُونَا، نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ)

অর্থ : ‘এখন থেকে আমরাই তাদের উপর আক্রমণ করব, তারা আমাদের উপর আক্রমণ করবে না। এখন আমাদের সৈন্যরা তাদের দিকে যাবে।’ (সহীহুল বুখারী ২য় খন্ড ৫৯০ পৃঃ)

ফুটনোট

[18] সহীহুল বুখারী, ১ম খন্ড